‘নব্য উদারবাদ’, বিশ্বায়ন ও পরিবর্তিত বৈশ্বিক মিডিয়া

ফাহমিদুল হক

বর্তমান বিশ্বায়নকে সঠিকভাবে সনাক্ত করলে তার নাম বলতে হবে একচেটিয়া পুঁজির বিশ্বায়ন। এই বিশ্বায়নে মুক্ত মানুষের বিশ্ব প্রতিষ্ঠার বদলে একচেটিয়া পুঁজি বা বহুজাতিক কর্পোরেশনের বৈশ্বিক আধিপত্য সম্প্রসারিত হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো মিডিয়া জগতও কতিপয় কোম্পানির দানবীয় কর্তৃত্বে বন্দী হয়ে গেছে। ফলে খবরসহ মিডিয়ার নানা আয়োজন এখন একইসাথে পণ্য এবং বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বাহন। এরফলে যখন আমরা মিডিয়ার জৌলুস বাড়তে দেখছি তখন তার সাথে হারিয়ে যাচ্ছে বহুকণ্ঠ ও জনস্বার্থের খবরাখবর। এই প্রবন্ধে মিডিয়াজগতের এই পরিবর্তনের উৎস অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

নব্য উদারবাদ ও বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন এবং এর সমস্যাগুলো বুঝতে হলে নব্য উদারবাদকে বুঝতে হয়। আবার এই প্রস্তাবনাকে ধরে নিয়ে যদি আমরা এগোই যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় মিডিয়ার অবস্থান কেন্দ্রে, তাহলে বর্তমান বৈশ্বিক মিডিয়ার আলোচনায় নব্য উদারবাদের প্রসঙ্গ এড়ানোর কোনো উপায় নেই। ক্রমশ নব্য উদারবাদ, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এবং পরিবর্তিত বৈশ্বিক মিডিয়ার পারস্পরিক অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারব এবং সেজন্য আমাদের প্রথমেই আলোচনা করতে হবে নব্য উদারবাদ নিয়ে।

নব্য উদারবাদের প্রধান দুটি দিক রয়েছে–অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। অর্থনৈতিক বিবেচনায় নব্য উদারবাদ মুক্তবাজার অর্থনীতির কথা বলে। আর রাজনৈতিক বিবেচনায় সেই মুক্তবাজারে রাষ্ট্রের যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপকে বাতিল করে। নব্য উদারবাদে এক ধরনের বাজার-মৌলবাদিতা কাজ করে; অর্থাৎ এক্ষেত্রে বলার ব্যাপার এই যে বাজারই সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। আর বাজারে রাষ্ট্রীয় গভর্নেন্স একেবারেই অনুভূত হতে দেওয়া যাবে না, বাজার তার নিজস্ব নিয়মে চলবে। উপরন্তু রাষ্ট্র সবকিছু বিনিয়ন্ত্রণ করবে, যা কিছু পাবলিক খাতে আছে, তার বেসরকারীকরণ করতে হবে। পাশাপাশি কমে আসবে জনগণের জন্য সরকারের কল্যাণমূলক ও সামাজিক সেবার সব কর্মসূচি।

শিকাগো স্কুল অব ইকোনমিকসের মিল্টন ফ্রিডম্যান (১৯৫০) এই ধারণার অন্যতম প্রচারক। আর একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতিবিদরা (যাঁদের ‘শিকাগো বয়েজ’ নামে ডাকা হয়) এর অন্যতম প্রচারক ও চর্চাকারী। জন লক ও অ্যাডাম স্মিথের মতো অর্থনীতিবিদরা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্লাসিক্যাল উদারবাদ ধারণার প্রবর্তন করেন। অনেকেই মনে করেন, ক্লাসিক্যাল উদারবাদ ও নব্য উদারবাদের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। ১৯৩০-এর দশক থেকে উদারবাদ নব্য উদারবাদ নামে পরিচিতি পায় এবং ১৯৮০-র দশক থেকে এর প্রয়োগ শুরু হয়। তবে নব্য উদারবাদের সফল পরীক্ষা করা হয় চিলিতে। ১৯৭৩ সালে চিলিতে সিআইএর প্রত্যক্ষ সহায়তায় মার্ক্সবাদী প্রেসিডেন্ট সালভেদর আয়েন্দেকে হত্যা করা হয় এবং জেনারেল অগাস্টো পিনোশেকে ক্ষমতায় বসানো হয়। এরপর সব শিকাগো বালক সে দেশে নব্য উদারবাদী ধারায় অর্থনৈতিক সংস্কার করেন। বড়সড় পটপরিবর্তন করিয়ে অর্থনৈতিক সংস্কারের এই প্রক্রিয়াকে নাওমি ক্লেইন (২০০৭) নাম দিয়েছেন ‘শক ডকট্রিন’। কেবল চিলি নয়, পৃথিবীর নানা দেশে এই কায়দায় পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা ফ্রিডম্যানের তত্ত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে। আশির দশকে রোনাল্ড রিগ্যানের যুক্তরাষ্ট্রে ও মার্গারেট থ্যাচারের যুক্তরাজ্যে নব্য উদারবাদের নীতির প্রয়োগ দেখা যায়। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর নব্য উদারবাদকে অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য বলে ধরে নেয় সবাই। ফলে নব্বইয়ের দশকের মধ্যভাগের পূর্বেই পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশ নব্য উদারবাদকে নিজ নিজ দেশে স্বাগত জানায়।

> মিডিয়া জৌলুস বৈশ্বিক পর্যায়ে পুঁজিবাদকে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে সক্ষম। টেলিভিশন সংবাদ যেমন জৌলুসপূর্ণ হয়ে ওঠে। কোন কোন সংবাদ বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা বিচারের চাইতে দৃশ্যগত জৌলুসই টেলিভিশন সংবাদে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

রবার্ট ডাব্লিউ ম্যাকচেজনি (২০০১) মনে করেন, জি-এইটের স্বার্থানুকুল বিশ্বায়নকে বুঝতে হলে আগে বুঝতে হবে নব্য উদারবাদকে। বিশ্বায়ন শব্দটার মধ্যে এক ধরনের সমস্বার্থের ধারণা আছে, যা বিভ্রান্তিকর হতে পারে। তাঁর ভাষায়, এটি আদর্শপোরা একটা শব্দ। অন্যদিকে নব্য উদারবাদ শব্দটার মধ্যে একটা ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম সাক্ষী হয়ে হাজির থাকে। এই বিবেচনায় তিনি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও নাফটার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন, বিশ্বায়নের যে আদর্শ ধারণা, যে পণ্য-মানবসম্পদ-সংস্কৃতির ন্যায্য বিনিময় হবে ভূগোলকের উত্তর-দক্ষিণ বা পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে, বর্তমানে প্রচলিত বিশ্বায়নে তা বাস্তবায়িত হয়নি। বরং যে তথাকথিত বিশ্বায়ন চালু হয়েছে, তা নব্য উদারবাদ প্রভাবিত এবং এতে জি-এইট বা পশ্চিমা পুঁজিবাদী বলয়ের স্বার্থ প্রতিফলিত হচ্ছে, যা বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, নাফটা, বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফের মতো তথাকথিত বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলো। আরেক অর্থে নব্য উদারবাদ ধারণা প্রচলিত হয়েছে ‘ওয়াশিংটন মতৈক্য’র ভিত্তিতে, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে, যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে।

আশির দশকের শেষভাগ থেকে নব্য উদারবাদ পরিস্থিতিতে যে নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, মিডিয়া হবে পুরোপুরি বাণিজ্যিক। যেসব দেশ ডাব্লিউটিওর অন্তর্ভুক্ত আছে তাদের বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের মিডিয়াকে ডিরেগুলেট করো, নিয়ন্ত্রণ করো না; পারলে সবকিছু বেসরকারি খাতে ছেড়ে দাও। তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তিক পুঁজিবাদী দেশগুলো তা মেনেছে। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য ৬৯টি দেশের সরকার তাদের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বেসরকারি খাতের একচেটিয়া

মালিকদের জন্য খুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবসার ৯০ শতাংশ এই উদারীকরণের আওতায় চলে আসে (মুখার্জি, ২০০২:১৭)। এতে আইবিএম, মাইক্রোসফট এবং অন্যদের যে কোনো দেশে অবাধে অনুপ্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত হয়। একথা অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমের জন্যও সত্য। ভারতে দীর্ঘদিন ভিএসএনএল বলে সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানই ইন্টারনেট সেবা দিত, যদিও ভিএসএনএলের গ্রাহকসেবা ভালো নয় এই অভিযোগ এনে, সংস্থাটির উন্নতি না ঘটিয়ে ব্যক্তি খাতের জন্য ইন্টারনেটকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বায়ন ও বৈশ্বিক মিডিয়ার সম্পর্ক

বিশ্বায়ন ও মিডিয়াকে পৃথকভাবে, আলাদা ডিসিপ্লিন হিসেবে অধ্যয়ন করা হয়েছে। কিন্তু এ দুই ডিসিপ্লিনকে একত্রে অধ্যয়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছে; কারণ আমরা মনে করছি, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় মিডিয়ার অবস্থান কেন্দ্রে। মিডিয়া হলো একই সঙ্গে বিশ্বায়নের কারণ ও ফলাফল।

বিশ্বায়ন অধ্যয়নে একটি স্বীকৃত নাম হলো অর্জুনা আপ্পাদুরাই (১৯৯৬)। তিনি বলেছেন, বিশ্বায়ন পাঁচটি 'স্কেপ' বা 'প্রেক্ষাপট' নিয়ে গঠিত। এগুলো হলো নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট, মিডিয়া প্রেক্ষাপট, প্রযুক্তি প্রেক্ষাপট, আর্থিক প্রেক্ষাপট ও মতাদর্শিক প্রেক্ষাপট। অর্থাৎ তাঁর মতে, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় মিডিয়ার গুরুত্ব অনেক, পাঁচটি মূল ধারণা ও চর্চার একটি। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন অসম্ভব ছিল স্যাটেলাইট টেলিভিশন কিংবা ইন্টারনেটের মতো মিডিয়া না থাকলে। মিডিয়া বিশ্বায়নকে সম্ভব করেছে এবং বিশ্বায়ন বিশ্বায়িত মিডিয়াকে চেয়েছে।

> পশ্চিমা দেশগুলো বাণিজ্যবিরোধী মিডিয়ার ব্যাপারে ও সমাজতান্ত্রিক বলয় সরকারি নিয়ন্ত্রণ বিলোপের বিষয়ে আপত্তি জানায় এবং তৃতীয় বিশ্ব অধিক ভারসাম্যপূর্ণ তথ্যপ্রবাহের দাবি করে।

মার্শাল ম্যাকলুহান (১৯৬৪/১৯৯৪) 'বিশ্বগ্রাম'-এর ধারণা দেন। তিনি খোদ মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের ওপর গুরুত্ব দেন (বাহনই বার্তা)। তাঁর মতে, মিডিয়া প্রতিষ্ঠান (যেমন–টেলিভিশন) গুরুত্বপূর্ণ, তার আধেয় (অনুষ্ঠানমালা) তত গুরুত্বপূর্ণ না-ও হতে পারে। এইসব ধারণার মাধ্যমে ম্যাকলুহান স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে, ব্যক্তিক মন্ময়তা ও সংস্কৃতি গঠনে মিডিয়ার যে ক্ষমতা, তার নতুন চেহারা দেন। অন্যদিকে গাই দিবোর্দ (দিবোর্দ, ১৯৬৭ উদ্ধৃত রিটজার, ২০১০:২৮৭) ধারণা দেন 'মিডিয়া জৌলুস' (মিডিয়া স্পেকটেকল)-এর। মিডিয়া জৌলুস বৈশ্বিক পর্যায়ে পুঁজিবাদকে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে সক্ষম। টেলিভিশন সংবাদ যেমন জৌলুসপূর্ণ হয়ে ওঠে। কোন কোন সংবাদ বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা বিচারের চাইতে দৃশ্যগত জৌলুসই টেলিভিশন সংবাদে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নয়-এগারোর সন্ত্রাসী হামলার দৃশ্য বা ভিস্যুয়াল যেমন এক জৌলুসময় দৃশ্য। বিশ্বায়নের প্রসারের প্রয়োজনে তাই বৈশ্বিক মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর এই বৈশ্বিক মিডিয়া জাতীয় হবার কোনো সুযোগ নেই। তার চরিত্র ও মালিকানা অবধারিতভাবে বহুজাতিক হয়ে উঠেছে। জর্জ রিটজারের (২০১০) মতে, বৈশ্বিক মিডিয়া সংস্কৃতি দেখা যাচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তারা নিজেরাই অনেক ক্ষেত্রে বহুজাতিক। তারা বিশ্বায়নের সঙ্গে নিচ থেকে নয়, ওপর থেকে সম্পর্কযুক্ত।

নব্য উদারবাদের পূর্বে কী পরিস্থিতি ছিল? তখন সাংবাদিকতা ছিল রাজনৈতিক আদর্শভিত্তিক। যত সময় এগিয়েছে, বলা হয়েছে, এটা নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা নয়। আমাদের বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করতে হবে। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার কাল পেরিয়ে আজ আমরা বিশ্বায়নের যুগের সাংবাদিকতায় উপনীত হয়েছি, যখন তথ্য নিতান্তই একটি পণ্য, আর মিডিয়া হলো অন্য সব পণ্য পরিচিতিকরণ ও বিপণনের উপায়। আশি ও নব্বইয়ের দশকের পূর্বে মিডিয়া ছিল জাতীয়। রেডিও ও টেলিভিশনের মালিকানা ছিল সরকারের। নব্য উদারবাদ পদক্ষেপের পর ব্যাপকভাবে বেসরকারি ও বাণিজ্যিক রেডিও-টেলিভিশন-সংবাদপত্রের বা কর্পোরেট মিডিয়ার আবির্ভাব ঘটেছে। বিশ্বায়নের পূর্বেও স্থানীয় বাজারগুলো আমদানীকৃত চলচ্চিত্র, টেলিভিশন শো, মিউজিক অ্যালবাম ও পুস্তকে সয়লাব হয়ে ছিল, যাতে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাধান্য ছিল, কিন্তু মিডিয়া ব্যবস্থায় স্থানীয় বাণিজ্যিক স্বার্থও দেখা হতো। এছাড়া সরকারি সম্প্রচার সেবা স্পষ্টতই স্থানীয় বাজারে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হার্বার্ট শিলার বলেন :

"১৯৮০-র দশক পর্যন্ত গণমাধ্যমগুলো সাধারণত জাতীয় মাধ্যম হিসেবেই বিদ্যমান ছিল। ...১৯৮০-র দশকে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এবং মার্কিন সরকার যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার জন্য এবং ব্যক্তি খাতে ছেড়ে দেবার জন্য চাপ দিতে থাকে এবং নতুন স্যাটেলাইট ও ডিজিটাল টেকনোলজির আবির্ভাবের কারণে বহুজাতিক মিডিয়া-দানবের উদ্ভব ঘটে" (শিলার, ১৯৯৭)।

'বহুজাতিক মিডিয়া-দানব' হলো সমসাময়িক বৈশ্বিক মিডিয়ার অন্যতম প্রবণতা। সে সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার যে নব্য উদারবাদ কার্যকর হবার পূর্বেও বৈশ্বিকভাবে সংবাদ পরিবেশন করার একটা চর্চা ছিল, কিন্তু তা আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার সেবাসমূহের মধ্যেই সীমিত ছিল।

সংবাদ সংস্থা : মিডিয়া বিশ্বায়নের আদি নিদর্শন

সংবাদ সংস্থা হলো সবচেয়ে পুরনো ইলেকট্রনিক মিডিয়া, যা মধ্য উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রেখে আসছে। বিদ্যুতের গতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সময় ও স্থানকে জয় করে সংবাদ পাঠানোর এই ব্যবস্থা বিশ্বায়নের ধারণাকে পোক্ত করে তুলেছে। তবে প্রথমত সংবাদ সংস্থাগুলো জাতীয় পরিচিতিকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে।

উনবিংশ শতকে স্থানীয় ও বৈশ্বিক সংবাদ সংস্থাগুলো পরস্পর নির্ভরশীল ছিল এবং বাণিজ্য জোটের (কার্টেল) মতো করে সংবাদ বিনিময় করত। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলো পর্যন্ত এই পারস্পরিক বিনিময় প্রথা চালু ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষে এসে জাতীয় সংবাদ সংস্থাগুলোর কিছু বন্ধ হয়ে যায় এবং কিছু বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। যেগুলো বাণিজ্যিক বা বহুজাতিক হয়ে পড়ে, সেগুলো টিকে যায়। সংবাদ বিক্রিতে তাদের যে পাইকারি অথবা খুচরা বিক্রেতার চেহারা ছিল এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ছিল, তা সিএনএনের আবির্ভাবে হুমকির মুখে পড়ে। বিবিসি ওয়ার্ল্ড ও আল-জাজিরার আবির্ভাবে তাদের সংখ্যা অনেক কমে আসে।

ইন্টারনেটের আবির্ভাবে নতুন নতুন প্রতিযোগী এসে হাজির হয়। সংবাদমূল্য ও মেধাস্বত্বের পুরনো ধারণাও হুমকির মুখে পড়ে। ফলে সংবাদকে সংজ্ঞায়িত করা ও বিক্রয়যোগ্য করা আরো কঠিন হয়ে ওঠে। তাই ২০০৮ সালের মধ্যেই সংবাদ সংস্থাগুলো তাদের ব্যবসার মডেল পাল্টে ফেলে। ইন্টারনেটকে আশ্রয় করেই তাদের কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়, পরিবেশনা পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

পর 'পঞ্চপ্রধান' সংবাদ সংস্থা ছিল এএফপি (প্যারিস), এপি (নিউ ইয়র্ক), রয়টার্স (লন্ডন), তাস (মস্কো), ইউপিআই (নিউ ইয়র্ক)। মধ্য নব্বইয়ের দশক থেকে মাত্র তিনটি প্রধান সংবাদ সংস্থা টিকে আছে। এপি প্রায়ই লোকসানে ভুগছিল, রয়টার্স সংবাদের চাইতে বেশি নির্ভর করেছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আর্থিক উপাত্ত সরবরাহের ওপর। ১৯৯৭ সালের দিকে দুই সংস্থাই নিজেদের সামলে ওঠে এবং এএফপি তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। টেলিভিশন সংবাদের জন্য ১৯৯৮ সালে মাত্র দুটি সংবাদ সংস্থা ছিল—রয়টার্স টেলিভিশন নিউজ এবং এপি টেলিভিশন নিউজ (এপিটিএন)।

১৯৭০-এর দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রবাহ নিয়ে আপত্তি জানাতে শুরু করে, একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও আপত্তি জানায়। সাংস্কৃতিক ও যোগাযোগ সংক্রান্ত আপত্তিগুলো তারা প্রথমে জানায় ইউনেস্কোর কাছে; পরে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের কাছে নালিশ জানায়। তথ্যের বৈষম্যমূলক প্রবাহ তাদের আপত্তির বিষয় ছিল, বিশেষত পশ্চিম থেকে টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, সংবাদ ও সংগীতের একরৈখিক প্রবাহ ও তা ঠেকাতে না পারার বিষয়ে তারা তাদের আশঙ্কার কথা তুলে ধরে। সমাজতান্ত্রিক বলয় তাদের সমর্থন করে। তারা তাদের নিজস্ব সংবাদ সংস্থা গঠনেরও চেষ্টা করে, বিশেষত নয়া বিশ্ব তথ্যপ্রবাহ (এনডাব্লিউআইও) বিতর্কের পর তারা এই উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তাদের গড়ে তোলা আঞ্চলিক বা দক্ষিণ বিশ্বের সংবাদ সংস্থাগুলো কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি। তথ্যের বৈষম্যমূলক প্রবাহ কিংবা প্রযুক্তির পার্থক্যের কথা পশ্চিম অস্বীকার করেনি, কিন্তু তারা বিশ্বব্যাংক বা আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা দিয়ে দায় সারতে চেয়েছে। পশ্চিম তথ্যকে পণ্য হিসেবে দেখেছে আর তৃতীয় বিশ্ব ও সমাজতান্ত্রিক বলয় তথ্যকে সামাজিক সেবা হিসেবে দেখতে চেয়েছে।

অধিগ্রহণ ও একীভবন বর্তমান পুঁজিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ওষুধ কোম্পানি, ইনস্যুরেন্স ও ব্যাংক, তথ্যপ্রযুক্তি, মিডিয়া প্রভৃতি কোম্পানির মধ্যে মার্জার ঘটে চলেছে। কখনো 'বোয়াল' কোম্পানি 'পুঁটি' কোম্পানিকে গিলে খাচ্ছে; কখনো দুই বোয়াল আরেক বৃহৎ বোয়ালে রূপান্তরিত হচ্ছে—এও অধিক মুনাফার জন্যই।

১৯৭৬ সালে ইউনেস্কো আয়ারল্যান্ডের শন ম্যাকব্রাইডের নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের ম্যাকব্রাইড কমিশন গঠন করে। ১৯৮০ সালে কমিশন ৮২টি সুপারিশসহ 'মেনি ভয়েসেস ওয়ান ওয়ার্ল্ড' প্রকাশ করে। ৭২টি সুপারিশ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, বাকিগুলো বাধার মুখে পড়ে। পশ্চিমা দেশগুলো বাণিজ্যবিরোধী মিডিয়ার ব্যাপারে ও সমাজতান্ত্রিক বলয় সরকারি নিয়ন্ত্রণ বিলোপের বিষয়ে আপত্তি জানায় এবং তৃতীয় বিশ্ব অধিক ভারসাম্যপূর্ণ তথ্যপ্রবাহের দাবি করে। ইউনেস্কো ম্যাকব্রাইড কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন করেনি। পরিবর্তে ১৯৮০ সালে তৃতীয় বিশ্বের মিডিয়াকে সাহায্য করার জন্য 'উন্নয়ন যোগাযোগের জন্য আন্তর্জাতিক কর্মসূচি' (আইপিডিসি) গঠন করে।

নয়া বিশ্ব তথ্যপ্রবাহ (এনডাব্লিউআইও) আন্দোলন মিইয়ে যাবার পর কিছু পশ্চিমা দেশ নব্য উদার বিশ্ব মিডিয়ার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার ব্যাপারে তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৮৯ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তার সদস্য দেশগুলোর মিডিয়ায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত অনুষ্ঠান প্রচারের বাধ্যবাধকতার কোটা নির্ধারণ করে। ১৯৯৩ সালে ফ্রান্স কর ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি (গ্যাট) থেকে শ্রুতিচিত্র মাধ্যমকে মুক্ত রাখতে সমর্থ হয়। ১৯৯৮ সালে কিছু পশ্চিমা ও তৃতীয় বিশ্বের দেশ ওতাওয়া ও স্টকহোমে মিলিত হয় মার্কিন মিডিয়ার প্রভাবমুক্ত থাকতে এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি থেকে সাংস্কৃতিক পণ্য মুক্ত রাখতে কিছু সুপারিশ করে। উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে গ্যাটের স্থানে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা স্থলাভিষিক্ত হয়, যে সংস্থাটি বর্তমানে বৈশ্বিক বাণিজ্যের নিয়ন্তা হিসেবে আবির্ভূত, যার অধীনে সংস্কৃতি, শিক্ষা ও যোগাযোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১৯৮৫ সালের পর থেকে ইউনেস্কো যোগাযোগ সংক্রান্ত স্পর্শকাতর বিষয়গুলো এড়িয়ে চলা শুরু করে এবং আলোকপাত করতে থাকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং তৃতীয় বিশ্বের মিডিয়া ব্যবস্থায় অবকাঠামোগত সহায়তা, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ওপর। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের সঙ্গে জাতিসংঘ ২০০১ সালে তথ্যসমাজ সম্পর্কিত সব ইস্যুকে মোকাবেলা করার জন্য তথ্যসমাজের বিশ্ব সম্মেলন (ডাব্লিউএসআইএস) আয়োজন করে ২০০৩ সালে জেনেভায় ও ২০০৫ সালে তিউনিসে। ডাব্লিউএসআইএসে যে বিষয়গুলো আলোচ্যসূচির অন্তর্গত ছিল সেগুলো হলো মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার, মেধাস্বত্ব, ভোক্তা সংরক্ষণ, গোপনীয়তা, জেন্ডার ইত্যাদি। তবে ডাব্লিউএসআইএস নব্য উদারবাদের বিরোধিতা করতে সক্ষম হয়নি; বরং গৃহীত নীতিগুলো মানবাধিকার ও বৈশ্বিক ন্যায্যতার ওপর কর্পোরেট স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করে। অন্যদিকে ইন্টারনেটে চলছে আইকানের প্রশাসনের আওতায়। আইকান হলো 'ইন্টারনেট কর্পোরেশন ফর অ্যাসাইন্ড নেমস অ্যান্ড নাম্বারস' এবং এটি একটি বেসরকারি কর্পোরেশন, যা মার্কিন বাণিজ্য বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়।

একীভবন, অধিগ্রহণ, পুঞ্জীভবন: পরিবর্তিত বৈশ্বিক মিডিয়া

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের বরাতে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনেকখানিই উৎপাদন খাত থেকে সেবা খাতের দিকে ধাবিত হয় এবং এই সেবা খাতের প্রায় পুরোটাই গড়ে ওঠে তথ্যপ্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে। এই পরিবর্তন ছাপিয়ে যে বৈশিষ্ট্য বর্তমান পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে ওঠে তা হলো একচেটিয়াত্ব, একীভবন (মার্জার) ও অধিগ্রহণ (অ্যাকুইজিশন)। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ছোট কোম্পানিগুলো বড় কোম্পানির মাঝে লীন হয়ে যাচ্ছে এবং মাত্র কিছু কোম্পানির একচেটিয়াত্ব কায়েম হচ্ছে। অধিগ্রহণ ও একীভবন বর্তমান পুঁজিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ওষুধ কোম্পানি, ইনস্যুরেন্স ও ব্যাংক, তথ্যপ্রযুক্তি, মিডিয়া প্রভৃতি কোম্পানির মধ্যে মার্জার ঘটে চলেছে। কখনো 'বোয়াল' কোম্পানি 'পুঁটি' কোম্পানিকে গিলে খাচ্ছে; কখনো দুই বোয়াল আরেক বৃহৎ বোয়ালে রূপান্তরিত হচ্ছে—এও অধিক মুনাফার জন্যই। তবে অনেকে আবার মনোপলির পরিবর্তে অলিগোপলি (কয়েকটি কোম্পানির একচেটিয়াত্ব) শব্দটি ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, কারণ তাতে প্রকৃত পরিস্থিতি ধরা পড়ে। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে অলিগোপলি ঘটেছে তেল ও অটোমোবাইল শিল্পে; এখন বেশি ঘটছে মিডিয়া, প্রযুক্তি ও বিনোদন শিল্পে।

যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের মতো বড় দেশে যখন মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণমুক্তি ঘটে গেল, এবং নাফটা বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্ম হলো, তখন আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বাজারে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেল। এভাবেই বিশ্ব

মিডিয়া ব্যবস্থায় দানবদের দেখা গেল। এখন এই ব্যবস্থাটা নিজস্ব যুক্তিতে চলছে–মিডিয়া-দানবদের আরো বড় হতে হবে এবং এভাবে ঝুঁকি কমানো ও মুনাফা বৃদ্ধিকে নিশ্চিত করতে হবে। তাদের অবশ্যই বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করতে হবে, যাতে প্রতিযোগীরা তাদের হটিয়ে দিতে না পারে। ২০০০ সালের প্রথম ভাগে বৈশ্বিক মিডিয়া, ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ খাতে ৩০০ বিলিয়ন ডলার একীভবন রফা হয়েছিল। এটা ১৯৯৯ সালের প্রথম ছয় মাসের তিন গুণ ছিল এবং আগের দশ বছরের সম্মিলিত পরিমাণের চাইতে বেশি। এইসব কায়কারবারের যুক্তি হলো, দ্রুত বড় হও, অনেক বড় হও, অথবা অন্যের পেটে ঢুকে পড়ো (ম্যাকচেজনি, ২০০১)।

বিশ্বায়ন কার্যকর করার দায়িত্ব নিয়ে মিডিয়া ও তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলো নিজেরাই একেকটি মেগা কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আর তথ্য যখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তথ্যমাধ্যমগুলোর রমরমা অবস্থাই হবার কথা। তাই বর্তমান পুঁজিবাদের সব লক্ষণই মিডিয়া ও তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। রবার্ট ম্যাকচেজনি কয়েকটি কোম্পানির এই মিডিয়া-বিশ্বকে বলছেন 'বড় দানবদের ছোট দুনিয়া' (ম্যাকচেজনি, ২০০১)।

বেন বাগডিকিয়ান (২০০৪) তাঁর বই 'মিডিয়া মনোপলি'র বিভিন্ন সংস্করণে বৈশ্বিক পর্যায়ে মিডিয়ার পুঞ্জীভবন নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। ১৯৮৩ সালে তিনি ৫০টি কোম্পানি খুঁজে পেয়েছিলেন, যারা বিশ্বের অর্ধেক বা তার চাইতে বেশি মিডিয়া ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করছে। ১৯৮৬ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ২৯ এবং ১৯৯৩ সালে সংখ্যাটি ২০-এ নেমে আসে। তাঁর গ্রন্থের সাম্প্রতিক সংস্করণে তিনি 'বৃহৎ পাঁচ' নিয়ে কথা বলছেন। এগুলো হলো এওএল-টাইমওয়ার্নার, ডিজনি, নিউজ কর্প, ভায়াকম ও বার্টেলসম্যান। এদের মধ্যে টাইমওয়ার্নার সর্ববৃহৎ। এক টাইমওয়ার্নারের ১৯৯৭ সালে মোট বিক্রির পরিমাণ ছিল ২৫ বিলিয়ন ডলার। ১৯৮৯ সালে টাইম ও ওয়ার্নার কমিউনিকেশনসের একীভবনের ফলে টাইমওয়ার্নারের আবির্ভাব হয়। এই টাইমওয়ার্নারের সঙ্গে আবার ২০০০ সালে আমেরিকান অনলাইনের (এওএল) আরেক একীভবন ইতিহাসের সর্ববৃহৎ একীভবনের রেকর্ড সৃষ্টি করে। কারণ এওএল ইতোমধ্যেই আমেরিকার বৃহত্তম ইন্টারনেট কোম্পানি ছিল, ইউরোপেও যার বিরাট বাজার ছিল।

ইন্টারনেটকে ঘিরে এরকম আশা করা হয়েছিল যে বৈশ্বিক মিডিয়া-দানবদের একচেটিয়াত্ব ইন্টারনেট বাতিল করে দেবে, কারণ ইন্টারনেটের এক রকম গণতান্ত্রিক চেহারা রয়েছে। কিন্তু বৃহৎ টেলিযোগাযোগ ও কম্পিউটার কর্পোরেশনগুলো ইন্টারনেটে ভালোমতোই উপনিবেশ স্থাপন করেছে এবং এর গণতান্ত্রিকতার হুমকিকে করায়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছে। আমেরিকান অনলাইনের একীভবনের কথা আগেই বলা হয়েছে। গুগল ইন্টারনেটে এক বিশাল দানবে পরিণত হয়েছে। গুগল ২০১০ থেকে গড়ে প্রতি সপ্তাহে একটি কোম্পানি কিনে নিচ্ছে। গুগল ২০০৬ সালে ১.৬৫ বিলিয়ন ডলারে ইউটিউব কিনে নিয়েছিল। নিউজ কর্পের প্রেসিডেন্ট পিটার শারনিন বলেছিলেন, বাজারের এমন এক বড় অংশ দখলে রাখতে হবে, যাতে অন্যরা আপনার সাথে রফা করতে বাধ্য হয় (ম্যাকচেজনি উদ্ধৃত, ২০০১)।

চিত্র ১: ছয়টি মিডিয়া-দানবের বৃত্তান্তসংক্ষেপ

(সূত্র: www.lovearth.net/mediamoguls.jpg)

২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মার্জার ঘটেছে ২০০৭ সালে (চিত্র ২)। ২০০৭ সালে ৮০৩টি মিডিয়ার একীভবন ঘটে সনাতনি ও নয়া মিডিয়া মিলে, যার আর্থিক মূল্য ছিল ১৫৪ বিলিয়ন ডলার। প্রথম শ্রেণির মিডিয়ার মধ্যকার একীভবন মূলত আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু মাঝারি আকারের মিডিয়ার মধ্যেও মার্জার ঘটে চলেছে, যার বিস্তৃতি আমেরিকা-ইউরোপ ছাড়িয়ে এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

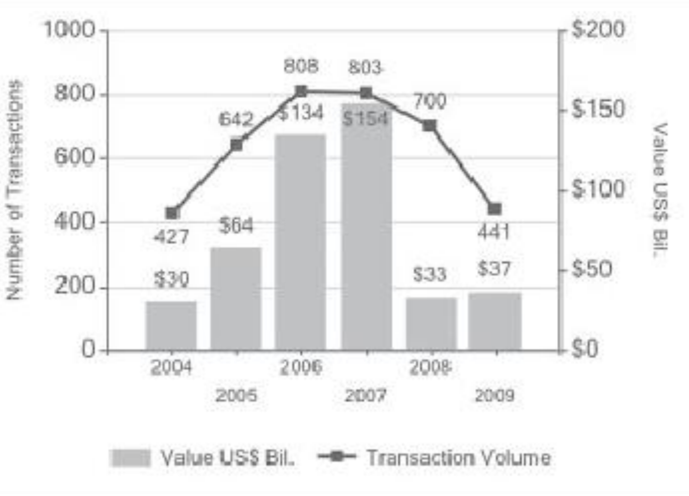

চিত্র ২: ২০০৪-০৯ সময়কালে মিডিয়া মার্জারের তুলনামূলক চিত্র

(সূত্র: http://berkerynoyes.com/publication/trend-report/2009/fullyear/media.aspx)

দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে একীভবন ঘটছে আরো দ্রুতগতিতে। প্রথম পর্যায়ের মতোই দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্পোরেশনগুলো রাষ্ট্রীয় সীমার বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। ক্যানওয়েস্ট গ্লোবাল কমিউনিকেশনের চেয়ারম্যান ২০০০ সালে বলেছিলেন, '*সীমান্ত নাই আর। আমাদের ব্যাপারটা বুঝতে হবে। তথ্যমহাসড়কের পাশে পড়ে থাকা মরদেহ হতে চাই না আমরা... । আমাদেরও একদিন কলম্বিয়া বা ওয়ার্নার ব্রাদার্স হতে হবে*' (ম্যাকচেজনি উদ্ধৃত, ২০০১)। মেক্সিকোর টেলিভিসতা, ব্রাজিলের গ্লোবো, আর্জেন্টিনার ক্লারিন, ভেনিজুয়েলার সিসনেরোস গ্রুপ হলো পৃথিবীর ৬০টি বৃহৎ মিডিয়া কর্পোরেশনের মধ্যে কয়েকটি। এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের জাতীয় ও আঞ্চলিক মিডিয়া বাজারে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, এবং পুঞ্জীভবন সেখানেও ঘটে চলেছে। অনেক বড় মিডিয়া কোম্পানিরই একই শেয়ারহোল্ডাররা আছেন এবং একে অন্যের আংশিক অংশের মালিক অথবা তাদের সাধারণ কিছু পরিচালক পর্ষদের সদস্য রয়েছে।

> বৃহৎ টেলিযোগাযোগ ও কম্পিউটার কর্পোরেশনগুলো ইন্টারনেটে ভালোমতোই উপনিবেশ স্থাপন করেছে এবং এর গণতান্ত্রিকতার হুমকিকে করায়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছে।

এই ধরনের একীভবন কেন ঘটছে? দেশে দেশে নব্য উদারবাদী নিয়ন্ত্রণমুক্তি বা ডিরেগুলেশনের মধ্য দিয়ে এর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আর নয়া যোগাযোগ-প্রযুক্তির স্থানকে অতিক্রম করার সুবিধাকে অবলম্বন করে এ ধরনের মিডিয়ার পুঞ্জীভবন সম্ভব হয়েছে। এখনকার অসম প্রতিযোগিতার সময়ে ছোট কোম্পানিগুলোর টিকে থাকাই দায়। তাই বড়গুলো ছোটগুলোকে অধিগ্রহণের প্রস্তাব করলে তাদের সাড়া না দিয়ে উপায় থাকে না। কারণ অসম প্রতিযোগিতায় তারা এমনিতেই বিলীন হয়ে যেত। সমপর্যায়ের একীভবনের অনেকগুলো কারণের একটি হলো স্টক মার্কেটে আকর্ষণ সৃষ্টি করা। আর বিদ্যমান সনাতন মিডিয়াগুলো, ডিজিটাল সময়ে নিজেদের গ্ল্যামার বাড়াতেও ছোট নয়া মাধ্যমকে কিনে নিচ্ছে।

আশির দশকের শেষভাগ থেকে এবং নব্বইয়ের দশকব্যাপী মিডিয়ার মাধ্যমের ব্যাপক বেসরকারীকরণের ফল হয়েছে এই, মিডিয়ায় সংবাদের পরিমাণ কমে গেছে এবং হালকা বিনোদনের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এবং এইসব বিনোদন-অনুষ্ঠান তৈরিতে খরচ কম কিন্তু আয় বেশি–বিজ্ঞাপন এই অংশেই বেশি আসে। বাণিজ্যিক টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর ক্ষেত্রে তাই প্রকৃত জাতীয় উন্নয়ন বিষয়ক কোনো অনুষ্ঠান দেখা যায় না। উন্নয়ন সম্পর্কে শুধু প্রচারিত হয় কর্পোরেট ভাষ্য। তারা কেবল মুনাফাই বোঝে, জাতীয় উন্নয়ন বা জনস্বার্থের জন্য তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

আর বৈশ্বিক মিডিয়ার ক্রমাগত একীভবন ও পুঞ্জীভবনের ফলে গণমাধ্যমগুলো থেকে যে বিভিন্ন কণ্ঠস্বর শোনা যেত, গণমাধ্যমের সেই বৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে, গেছে। একসময় বিভিন্ন ধরনের মিডিয়ার অস্তিত্ব ছিল–ছোট পত্রিকা, বড় পত্রিকা, শ্রমিকদের পত্রিকা, রাজনীতিবিদদের পত্রিকা–তাদের পরিবেশিত বার্তা, রাজনৈতিক আদর্শ নানাধর্মী ছিল। কিন্তু এখন সেই বৈচিত্র্য আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বৈশ্বিক মিডিয়ার ভূমিকা একরকম দাঁড়িয়েছে বাজারের পক্ষে কাজ করা, কর্পোরেট কালচার সরবরাহ করা, ভোক্তা-সংস্কৃতি উপহার দেওয়া, হালকা বিনোদনে অডিয়েন্সকে বুঁদ করে রাখা, বিজ্ঞাপনের জোয়ারে ভাসিয়ে দেওয়া, সর্বোপরি সমাজে বিদ্যমান প্রকৃত সমস্যা ও বৈষম্য থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে ভিন্ন কিছু নিয়ে ব্যস্ত রাখা। বৃহৎ দানবদের পরিবেশিত এই মাধ্যম-সংস্কৃতি প্রান্তিক দেশের মিডিয়াগুলোও অকাতরে গ্রহণ করছে। ফলে আমরা বৈচিত্র্যহীন, অগভীর, একরৈখিক এক মিডিওলজির (মিডিয়ার ইডিওলজি) মধ্যে বসবাস করছি।

উপসংহার

নব্য উদারবাদ নীতির আলোকে যে বিশ্বায়ন, তার প্রয়োজনে মিডিয়ার যে পুঞ্জীভবন, তাকে ঠেকানোর কোনো উপায় নেই বললেই চলে। বস্তুত মূলধারার বৈশ্বিক মিডিয়ার কাছে বিশ্বমানবতার সেবা সংশ্লিষ্ট কিছু আশা করার দিনও ফুরিয়েছে। অগত্যা তাদের কার্যকলাপ ও তাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ঠিকঠাকমতো বুঝতে পারাই আমাদের একমাত্র কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। এজন্য আমাদের সমালোচনাত্মক দৃষ্টিটা খোলা রাখতে হবে। আর জনসেবামূলক যে মিডিয়াগুলো এখনো আছে, তাদের টিকিয়ে রাখা আরেকটি কাজ হতে পারে। বিকল্প উদ্যোগও নিতে হবে। মানুষ তার সৃষ্টিশীলতা দিয়ে বিকল্প সংবাদমাধ্যম গড়ে তুলেছে ইন্টারনেটে; নব্য উদার অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে যেমন অকুপাই আন্দোলন শুরু হয়েছে খোদ পশ্চিমা দেশগুলোতেই। নাগরিক সাংবাদিকরা সামাজিক মাধ্যমগুলোতে সংবাদের ভিন্ন ভাষ্য বা উপেক্ষিত সংবাদগুলোকে হাজির করছে। ম্যানুয়েল ক্যাস্টেলসের (২০০৭) ভাষায় : ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক বা ডিজিটাল বিভিন্ন মাধ্যমে পরস্পরের যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষ যে 'নেটওয়ার্ক সমাজ' গড়ে তুলেছে, তাতে 'অনুভূমিক যোগাযোগ'-এর মধ্য দিয়ে 'পাল্টা ক্ষমতা' (কাউন্টার পাওয়ার) সৃষ্টি করেছে। মানুষের ঐক্য ও যৌথতাই হতে পারে সব ধরনের অলিগোপলির পাল্টা জবাব, সেটা অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে যেমন সত্য, মিডিয়াকে মোকাবেলা করার জন্যও সত্য।

[প্রবন্ধটি ঢাকায় *বাঙলার পাঠশালা* আয়োজিত 'নব্য উদারবাদ ও দক্ষিণ এশিয়া ২০১৪' শীর্ষক সম্মেলনে ২২ আগস্ট ২০১৪ তারিখে পঠিত।]

ফাহমিদুল হক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক
ইমেইল: fahmidul.haq@gmail.com

তথ্যসূত্র:

[আপ্পাদুরাই, ১৯৯৬] অর্জুনা আপ্পাদুরাই: 'মডার্নিটি অ্যাট লার্জ : কালচারাল ডাইমেনশন অব গ্লোবালাইজেশন'। মিনেসোটা : ইউনিভার্সিটি মিনেসোটা প্রেস।

[ক্যাসটেলস, ২০০৭] ম্যানুয়েল ক্যাসটেলস: কমিউনিকেশন, পাওয়ার অ্যান্ড কাউন্টার পাওয়ার ইন দ্য নেটওয়ার্ক সোসাইটি। 'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব কমিউনিকেশন'। সংখ্যা ১ : ২৩৮-২৬৬।

[ক্রেইন, ২০০৭] নাওমি ক্রেইন: 'দ্য শক ডকট্রিন : দ্য রাইজ অব ডিজাস্টার ক্যাপিটালিজম'। নিউ ইয়র্ক : মেট্রোপলিটন বুকস।

[ফুকস, ২০১২] ক্রিস্টিয়ান ফুকস: গুগল ক্যাপিটালিজম, 'ট্রিপল সি'। ১০(১) : ৪২-৪৮।

[বাগডিকিয়ান, ২০০৪] বেন বাগডিকিয়ান: 'দ্য নিউ মিডিয়া মনোপলি'। বোস্টন : বিকন প্রেস।

[ম্যাকলুহান, ১৯৯৪] মার্শাল ম্যাকলুহান: 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিডিয়া : দি এক্সটেনশনস অব ম্যান'। কেমব্রিজ : দি এমআইটি প্রেস।

[ম্যাকচেজনি, ২০০১] রবার্ট ডাব্লিউ ম্যাকচেজনি: গ্লোবাল মিডিয়া, নিওলিবারালিজম অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম। www.monthlyreview.org/ 2001/03/01/ global-media-neoliberalism-imeprialism.

[মুখার্জি, ২০০২] মানব মুখার্জি: তথ্যপ্রযুক্তি, পুঁজিবাদ এবং ভবিষ্যৎ। মানব মুখার্জি ও অন্যান্য (সম্পা.), 'প্রসঙ্গ : তথ্যপ্রযুক্তি'। কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

[রিটজার, ২০১০] জর্জ রিটজার: গ্লোবালাইজেশন : এ বেসিক টেক্সট। ওয়েস্ট সাসেক্স : উইলি-ব্ল্যাকওয়েল।